ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান

مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي

< بنغالي >

চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

أبو الكلام أزاد

৯০৩

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة: د/أبو بكر محمد زكريا

ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ﴾ [النساء: ١]

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদের একটিমাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের (এ আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ার চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]

কুরআনের সরল দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে নারী-পুরুষ উভয়ে একই নিয়তির অংশীদার, আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা অভিন্ন এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও এক ও অভিন্ন। যদি তাই হয়, তবে এটা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে, এমন একটি ধর্ম এমন সব বিধি বিধানকে অনুমোদন করবে যা নারী সমাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন?

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে নারীরা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং তিনি নিজে নারীদের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর তরুণী স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার মধ্যকার প্রেমোপাখ্যান কার অজানা? তবে একটি বিষয় বহুল প্রচারিত নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত একক দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেন, যিনি তাঁর থেকে ১৫ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও নিজেই তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

আরও বাস্তবতা হচ্ছে এটাই যে, মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে পরবর্তীকালে তিনি যেসকল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তার কারণ ছিল সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং প্রকৃতি ছিল রাজনৈতিক ও মানবিক। এটা কী করে সম্ভব যে, এমন একটি মানুষ তার বাণীতে নারীবিদ্বেষ প্রচার করবেন?

তবুও পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম প্রসারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে এ কুসংস্কারমূলক কুৎসা, যা আজ একটি প্রচার-যান্ত্রিক বিকারে পরিণত হয়েছে যে, মুসলিম সমাজ নাকি নারী ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী, তারা পাক ঘরের বাক স্বাধীনতাহীন বন্দি মাত্র।

এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমেই জেনে নিতে হবে, বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই নারীরা তাদের কর্মস্থলে বিভিন্ন প্রকার অযৌক্তিক অসাম্যের শিকার হচ্ছে।

যখন খোদ আমেরিকাতেই একই কাজের জন্য নারী কর্মীরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের বেতনের মাত্র ৬৪ শতাংশ প্রাপ্ত হন, আর তখন সুইডেনের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও তা ৮১ শতাংশের বেশি নয়।

আর সন্তান হিসেবে পুত্র কামনার অপসংস্কৃতিটিও বিশ্বব্যাপী একই মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। যাকে কুরআনে পরিস্কার ভাষায় ভৎর্সনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ۝٥٨﴾ [النحل: ٥٨]

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা রাগান্বিত অবস্থায় মলিন হয়ে যায়।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮]

এখনো ভারতীয়, চৈনিক অথবা ল্যাটিন খ্রিস্টান সমাজে নারীসন্তান আরবীয় সমাজের তুলনায় বেশি কাম্য নয়। তবে এখানে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এটি এমনই একটি অপসংস্কৃতি যার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে নারী সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন।

সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কিত খাঁটি ইসলামী বিধানগুলোর স্বরূপ উদঘাটন করা আজ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ ধরনের উপাদানের সংখ্যা খুব একটা বেশিও নয়। আমরা এখানে বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত বিধানগুলো নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

বিবাহ:

'মৌনতা সম্মতি নয়' নীতিটি ইসলামী আইনেও যথাযথভাবে স্বীকৃত। তবুও আগে বিবাহ হয় নি -এমন তরুণী মৌনতার মাধ্যমেও তার সম্মতি প্রদান করতে পারে। তরুণীর স্বভাবসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচকে বিচেনায় এনে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তার মতামতের বিরুদ্ধে একজন মুসলিম নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব। একজন মুসলিম নারী কেবল একজন মুসলিম পুরুষকেই বিবাহ করতে পারে।
কিন্তু একজন মুসলিম পুরুষ কোনো গ্রন্থধারী তথা খ্রিস্টান বা ইয়াহূদী নারীকে বিবাহ করতে পারে।

যদিও কেউ কেউ বলেন, এ বিধানটি এসেছে ইসলামের অপর একটি বিধানের প্রতিক্রিয়ায়, যেখানে বলা হয়েছে, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের লালন পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে পিতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, যার ফলে একজন মুসলিম স্ত্রীর পক্ষে তার বিধর্মী স্বামীর সন্তানকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না বিধায় এ ধরনের বিবাহ ইসলামে আইনসিদ্ধ নয়। এটি একটি মতো। তার উপরও বড় কথা হচ্ছে মুসলিম ও মুশরিকের মধ্যকার বিবাহ ইসলাম অনুমোদন করে নি।

একজন মুসলিম নারী মাত্র একজন স্বামীকে বিবাহ করতে পারে; কিন্তু একজন মুসলিম পুরুষ শর্ত সাপেক্ষে, একাধারে চারজন পর্যন্ত স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। এ বিধানের পেছনে যৌক্তিকতা বহুবিধ, তার মাঝে পিতৃত্ব নির্ধারণের সমস্যাটি অন্যতম।

একাধিক বিবাহের পূর্বশর্ত পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হচ্ছে:

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۝٣﴾ [النساء: ٣]

"আর যদি তোমাদের এ আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে যেসব নারীকে তোমাদের ভালো লাগে তাদের মধ্য থেকে দু'জন, তিনজন, কিংবা চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু

(এখানেও) যদি তোমাদের ওই ভয় হয় যে, তোমরা (একের অধিকের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্য) একজনই।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

শর্তটি সম্পর্কে কুরআন যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং দৃঢ়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ﴾ [النساء: ١٢٩]

“তোমরা কখনো (তোমাদের) একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না -যদিও তোমরা তা করতে চাইবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৯]

আল্লাহ তা‘আলা বারংবার একাধিক স্ত্রীসম্পন্ন স্বামীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: “অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।”

এমন অনেক আধুনিক, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় বেড়ে ওঠা নারী আছেন। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরিয়ম জামিলা, যিনি ইহুদিবাদ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যারা স্বীকার করেছেন যে, তারা একাধিক স্ত্রীর সাথে স্বামীর ঘর করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং এদের অনেকেই স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য অনুরোধ পর্যন্ত করেছেন।

ক্যান্সারে আক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী একজন নারী স্বভাবতই চাইবেন যে, তার ঘরে একজন দ্বিতীয় স্ত্রী আসুক, যাকে তিনি নিজের হাতে সব দেখিয়ে শুনিয়ে, নিজ সন্তানদের সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে। সে-ই সাথে নিজ স্বামীর সাথে নতুন করে সম্পর্ক করা। এটা ধারণা মাত্র নয়; বরং সাক্ষাৎ বাস্তবতা।

বর্তমান বিশ্বে বহু স্ত্রী বিবাহ ব্যতিক্রম হলেও কোনো অবস্থাতেই নৈতিকতা বিরোধী নয়, জার্মান আইনের ভাষ্যও এটাই।

চূড়ান্ত বিচারে বহু স্ত্রী বিবাহকে এক কথায় নিষিদ্ধ বা অনৈতিক ঘোষণা করা শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয় অপরিণামদর্শীও বটে।

পারিবারিক জীবন: পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে দাম্পত্য জুটির মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে তার সমাধানের উপযুক্ত পন্থা কী হওয়া উচিৎ। এটা বিশ্বব্যাপী আইন ব্যবস্থাগুলোর সামনে একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দু’জনের মধ্যকার মতবিরোধের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বের করা সম্ভব নয়। কারণ ভোটই মাত্র দু’টি। এ সমস্যার সম্ভাব্য দু’টি সমাধান হতে পারে:

সাধারণভাবে বা বিশেষ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতাটি দু’জনের একজনের ওপর ছেড়ে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে তার মতামত ভোট হিসেবে বিবেচিত হবে -এটাই ইসলামী পন্থা। অথবা সমস্যাটিকে দাম্পত্য জুটির বাইরে নিয়ে গিয়ে বৃহত্তর পারিবারিক পরিসরে, রেজিস্ট্রি অফিস অথবা আদালতের সামনে হাজির করা। এটাই বর্তমানে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। যার ফলাফল অনেকটা অনিশ্চিত।

ইসলাম পারিবারিক মতবিরোধগুলোকে গৃহের অভ্যন্তরেই সমাধান করার পক্ষপাতী। পরিবারের কর্তা হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্বসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটি ইসলাম স্বামীর ওপরই অর্পণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]

"পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপক ও) পরিচালক, কারণ আল্লাহ তা'আলা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর কিছু বিশেষ (বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে) মর্যাদা দিয়েছেন (পুরুষদের এই পরিচালনার দায়িত্বের), আরেকটি কারণ হচ্ছে যে, তারা (দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য এবং তাকে অব্যাহত রাখার জন্য) নিজেরা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

অবশ্যই এর দ্বারা মাতা শিশু সন্তানের লালন-পালন ও সে সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হন না (এ সংক্রান্ত মতবিরোধের ক্ষেত্রে মাতার ভোটটিই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে), ঠিক একই সাথে মোহরানার অর্থসহ তার যাবতীয় ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজন বোধে হস্তান্তরের পূর্ণ ক্ষমতাও তার রয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ১৪০০ বছর আগ থেকেই মুসলিম নারীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিপূর্ণ বিভাজনের সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করে আসছেন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় নারীরা, যদি এ ক্ষমতা আদৌ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তবে তা বিংশ শতকের মধ্যভাগের আগে নয়।

ইসলাম মাতৃত্বকেই নারীর পূর্ণতা ও সামাজিক উচ্চ মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। সন্তানই হচ্ছে তার সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল ক্ষেত্র। এটাই তার সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি। মাতার খেদমতেই সন্তানের জান্নাত। রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বিখ্যাত উক্তির মাধ্যেই মাতৃত্বের চরম মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদত্ত হয়। সমাজে নারীকে প্রদত্ত মর্যাদার প্রমাণ হিসেবে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, একজন সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের কুৎসা রচনা বা অভিযোগ উত্থাপন করাটা শরী'আহ্ অনুযায়ী কঠিন শস্তিযোগ্য অপরাধ (২৫:৪)।

অবশ্য মুসলিম আইন বিশারদদের মত অনুসারে ধর্ষণ বা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ মানব ভ্রূণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট নারীর বা অন্য কারো থাকে না, জরায়ুর স্বাধীনতাপন্থী নারীবাদীরা যা ই বলুক না কেন। ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিরিখে কুরআন জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনাকে বে-আইনি ঘোষণা না করলেও স্বেচ্ছায় গর্ভপাতকে স্বীকৃতি দেয় না। (১৭: ৩৩)

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মধ্যে তথাকথিত জীবনবাদী এবং মুক্ত সিদ্ধান্তবাদী জল্পনা-কল্পনার কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম বিবাহকে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য যুগপৎ একটি ধর্মীয় দায়িত্ব এবং উপসনার একটি ধারা বিশেষ বিবেচনা করে। ব্রাম্মচার্য ও ধর্মাশ্রয়ী চিরকৌমার্যকে ইসলাম পূর্বতন ঐশী বিধানগুলোর অপব্যাখ্যাগত বিকৃতি বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

ইসলামে অবশ্য চিরস্থায়ী বিবাহবন্ধনকেই আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। অস্থায়ী বিবাহবন্ধন (মুতা) শুধু শিয়াবাদী আইনশাস্ত্রই অনুমোদন করে মাত্র। দাম্পত্য জীবনকে ইসলাম একটি অতি গুরুৎপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান করে এবং তা সংরক্ষণে প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পরামর্শ প্রদান করে। এ কারণেই ইসলাম বিবাহবন্ধন-বহির্ভূত যৌন মিলন (১৭:৩২) নিষিদ্ধ করেছে:

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الاسراء: ٣٢]

“তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছে যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩২]

এবং সমকামিতাকে চরমভাবে নিষিদ্ধ করেছে। (৭:৮১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ ٨١﴾ [الاعراف: ٨١]

“তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে যৌন কামনা পূর্ণ করছো। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৮১]

অন্যত্র বলেন,

﴿أَئِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ ٥٥﴾ [النمل: ٥٥]

“তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে যৌন কামনা পূর্ণ করছ? তোমরা তো মুর্খ সম্প্রদায়।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৫৫]

ব্যভিচার ও সমকামিতাকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, বিবাহবিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করে এবং রহস্যময় প্রাচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে যথাযথ ভূষণবিধি (Dress Code) অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করে।

কুরআনের যে একটি আয়াত নিয়ে এত যে সব আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় তা নিতান্তই এ প্রতিষ্ঠান (সংসার) টিকিয়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। চরমতম অপব্যাখ্যা আর অপব্যবহারের শিকার এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনবোধে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হিসেবে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে, যা মূলত নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا﴾ [النساء: ٣٤]

“আর যখন কোনো নারীর অবাধ্যতার (ও ঔদ্ধত্যের) ব্যাপার তোমরা আশঙ্কা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথায়) উপদেশ দাও, (তা যদি কার্যকর না হয় তাহলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও যদি তারা ভালো না হয়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের প্রহার করো, তবে যদি তারা (এসব কিছু ছাড়াই) অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেওয়ার) জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়িও না, (মনে রেখো) নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চেয়ে মহান। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

ইসলামী সুন্নাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্রোধের বশবতী হয়ে হঠকারী বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতিষেধক হিসেবেই এই বিধানটি এসেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণীটি স্মরণ করা প্রয়োজন, যেখানে তিনি বলেছেন, আইনসিদ্ধ কাজগলোর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজটি হচ্ছে

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো। এ কারণে প্রাথমিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এখানে প্রহার বলতে মূলত ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশকেই বোঝানো হয়েছে, যা কখনো বাহ্যজ্ঞান স্মারক মৃদু চপেটাঘাত অথবা রুমাল বা হাতপাখার দ্বারা আঘাতের পর্যায়ে যেতে পারে মাত্র এবং কোনো অবস্থাতেই তা দৈহিক নির্যাতনের পর্যায়ে যাবে না। পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রযোজ্য এ চূড়ান্ত ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে যা-ই কিছু চিন্তা করা হোক না কেন, তা এই সমস্যা সঙ্কুল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় তো নয়ই; বরং সমস্যার জটিলতাকেই বাড়িয়ে দেয় মাত্র। উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কখনো তাঁর স্ত্রীগণের কারো উপর কোনো প্রকার দৈহিক শাস্তি আরোপ করেন নি।

সমাপ্ত